Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৩ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৬ই কার্ত্তিক, ১৪৩০ / 24.10.2023

= সম্পাদক =

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

গীতায় কর্মযোগ	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
রাজযোগ	শ্রী অরবিন্দ
স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচৈতন্য প্রণতি	ডঃ রুহিদাস সাহা
জ্ঞান অজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণদেব	শ্রী সৌমিত্র মজুমদার
তোমার জন্য	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

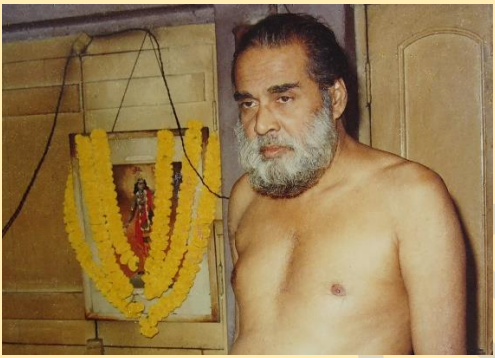

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

গীতায় কর্মযোগ

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

আমরা এ সংসারে ঈশ্বরের লীলার সহায়তা করবার জন্য এসেছি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আমাদের দিব্য কর্মের আদর্শে চলবার নির্দেশ দিয়েছেন, কর্মকে যোগের অঙ্গ বলে শিক্ষা দিয়েছেন। নৈষ্কর্ম্য চাই, অর্থাৎ নিষ্কর্মতা চাই, কিন্তু এর অর্থ কর্ম ত্যাগ নয়। প্রকৃতি সকল কাজ করছে, পুরুষ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা - এই উপলব্ধিটাই নৈষ্কর্ম্য। সকল কাজ বা কর্ম ত্যাগ করলেই এই উপলব্ধি পাওয়া যায়, শান্ত দ্রষ্টার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় - এ ধারণা ভ্রান্ত। কর্মত্যাগ মুক্তি লাভের জন্য অবশ্য কর্তব্য হওয়া দূরে থাকুক ইহা কোন মতে সম্ভব নয়। প্রাকৃত জগতে দেহধারী মানুষ নিমেষের জন্যও কর্ম না করে থাকতে পারে না। মানুষের জীবন ধারণটাই একটা কর্ম। এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্য কর্ম করতে হবে আত্মসংযমের দ্বারা। আত্মসংযম বলতে আত্মনিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয়না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং এই আসক্তি

DO NOT COPY

বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা। যিনি এই ভাব ও নিষ্ঠা নিয়ে সাধন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। কারণ, কর্মযোগের দ্বারা তাঁর প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর হয়।

অনেকে গীতার "নিয়তং কর্মাণি" বলতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মই বুঝে থাকেন। আসলে "নিয়তং কর্ম" হল ইন্দ্রিয়সকল সংযত করে যে কর্ম করা যায় তা-ই। কর্ম যখন ছাড়া চলে না তখন সংযতভাবে কর্ম করা দরকার। শুধু বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান নহে, সংসারের সকল কর্মই ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করতে হবে। অহংভাব সকল বন্ধনের মূল। স্বার্থের বশে কর্ম না করে কোনরূপ অহংচিন্তা না রেখে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারি। নিজেকে, নিজের বলে যা কিছু আমরা মনে করি সে সবকে প্রেম ও ভক্তির সাথে পরের জন্য উৎসর্গ করা এই যজ্ঞের নীতি। এতে অহং ভাব প্রশমিত হয়। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। অহং নির্মূল হলেই আমরা সহজেই দিব্যজীবন লাভ করতে পারব। পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের দ্বারাই এই বিশ্বজীবন ও মানবসমাজ চলছে। আমাদের যা কিছু শক্তি ও সম্পদ সে সবই লাভ করছি দেবতাদের অনুগ্রহে। জগত কল্যাণের জন্য সে সব যদি আমরা প্রয়োগ না করি, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র ভোগের জন্য প্রয়োগ করি তাহলে আমরা অপহরণকারী।

যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছেন তাঁর সত্তার বিকাশ পূর্ণ হয়েছে। অতএব তাঁর নিজের জন্য কোন কর্মের প্রয়োজন নাই। সাধারণ লোক সুখের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্য কাম ক্রোধের দ্বারা বিচলিত হয়। যে কোন কর্মে, সংসারে বা জীবনে সে শান্তি পায় না। সব কিছুকেই যদি সে যজ্ঞরূপে ঈশ্বরে অর্পণ করে তাহলে জীবনে দুঃখ ও কাতরতায় ভুগতে হয় না। যেমন মুক্তপুরুষ বা সাধক - যাঁরা কোন কিছুর জন্য দেবতা বা মানব কাহারও উপর নির্ভর

করেন না, তাঁরা ব্রহ্ম আনন্দে আনন্দময়। কর্ম করা না করা কোনটিতে তাঁদের লাভ নাই। কর্ম করা না করা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে না।

কর্ম তিন প্রকার। দেবতাকে উৎসর্গ না করে শুধু ব্যক্তিগত ভোগ সুখের জন্য আমরা যে কর্ম করি এ কর্ম বৃথা। ইহাতে দিব্য জীবন লাভ হয় না। পরন্তু সংসারের নিত্য দুঃখ কষ্টের জ্বালায় জ্বলতে হয়। আর এক - কর্মফলকামনা নিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করে যে কর্ম করা যায় এবং ফলস্বরূপ যে অংশ থাকে তা গ্রহণ করা। এই রকম কর্ম উৎসর্গীকৃত এবং কল্যাণময়। আর এক কর্ম, তা হল সকল রকম বাসনা ও আসক্তি হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যে কর্ম করা হয়। তার দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করা যায়। যেমন জনক রাজা সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত ও আসক্তিশূন্য হয়ে ছিলেন। আবার জ্ঞান লাভ করলে কর্ম ত্যাগ করতে হবে তা নয়, নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মের ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সিদ্ধিলাভের পরও কর্ম করা চলে, করতেও হবে, - কিন্তু সে কর্ম ব্যক্তিগত লাভ অলাভের চিন্তা দ্বারা হবে না, সে কর্ম হবে জগতে ভগবত ইচ্ছা সম্পাদন, লোক সকলকে ভগবৎ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা।

এমন কোনও জিনিস নাই যা ভগবানের নয় বা তাঁকে কর্ম করে লাভ করতে হবে। তথাপি তিনি সর্বদা কর্ম করছেন, সর্বদা বিদ্যমান আছেন, লোক সকলকে জীবন সংগ্রামে ধরে আছেন, সাহায্য করছেন, পথ দেখাচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা মনে করেন তাঁরা কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য। কিন্তু ভগবান কি কর্ম ত্যাগ করেছেন? তিনি তো সর্বদাই কর্মে ব্যাপৃত আছেন।

যাদের প্রকৃতির ঝোঁক কর্মের দিকে তাদের কর্ম ত্যাগের শিক্ষা দিলে তাদের বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব আসবে। এতে কোন সুফল পাওয়া যায় না। জীবনে দুঃখ আছে, বিপদ আছে, এ সবের সঙ্গে সংগ্রাম করেই মানুষের প্রকৃতির বিকাশ হয়।

DO NOT COPY

তামসিকতার বশে যদি আমরা সংগ্রাম থেকে পশ্চাৎপদ হই তাহলে আমাদের অধোগতি হবে।

আমাদের দেহ ও মনের দ্বারা যে সব কর্ম করি তাতে আমরা আবদ্ধ হই বা না হই - দোষ নাই। দেহ মন প্রাণে অসীম শক্তিময়ী প্রকৃতির কর্ম চলবেই। এদের মধ্যে বিপজ্জনক যেটি সেটি হচ্ছে তাহার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মোহিনী শক্তি। তারা বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে ও আত্মাকে আচ্ছাদিত করে। এর প্রভাবে মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে যায়।

মূল কথা হচ্ছে কর্মের দ্বারা যদি পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন লাভ করতে চাই তাহলে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই হওয়া চাই আমাদের জীবনের মূল নীতি। যার যেরূপ শ্রদ্ধা তার তেমন গতি লাভ হবে। শ্রদ্ধা শুধু মানসিক বিশ্বাস নয়, শ্রদ্ধা হচ্ছে জানবার, দেখবার, বিশ্বাস করবার এবং সেইমত জীবনকে গড়ে তুলবার আন্তরিক সঙ্কল্প।

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

গত ২৪শে নভেম্বর (১৯৯০) আমরা শ্রীপ্রীতিকুমারকে সকলে একত্রিত হয়ে স্মরণ করলাম। গোটা বাড়িটা লোকজনে ভরে ছিল। আমার একবারও মনে হয়নি তিনি সশরীরে উপস্থিত নেই। মনে হয়েছে তাঁর সেই খাটে শুয়ে সেই হাসি হাসি মুখে সব কিছু লক্ষ্য করছেন। শ্রীপ্রীতিকুমার সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ দিনে আমি কাউকে আমন্ত্রণ জানাই না। সব ভক্ত প্রিয়জনেরা যে যার মত আসেন।

প্রতি সোমবার সকলে আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফেরার চেষ্টা করি। সকলের প্রতীক্ষা শেষ করে চা করি।

শ্রীপ্রীতিকুমার চা পান দেরীতে। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন, "আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকি।" কথা দিয়ে না এলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন। প্রচণ্ড রাগ করতেন। শ্রীপ্রীতিকুমারের ঘরের দরজা আমি বন্ধ করতে পারি না। আমি অত্যন্ত সাধারণ মহিলা। আমাকে চাকরী করতে বা নিজের সংসারের কাজকর্ম করতে হয়। যদি কারও আসার কথা থাকে অথচ না আসেন, তখন ভীষণ ক্ষোভ হয়। মনে হয়, যে সময়টা প্রতীক্ষায় বৃথা নষ্ট হল, সেই সময়টা তো আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। কিছু পড়াশোনা করতে পারতাম। একসময় রেগে ঠিক করেছিলাম এবার থেকে সোমবারে মাসে একটি দিন সকলের সঙ্গে দেখা করব। বাকী দিনগুলো ব্যক্তিগত কাজ করব। কোনদিন গীতাদির বাড়ি, কোনদিন শান্তিদির বাড়ি, কোনদিন মীরার বাড়ি, কোনদিন চিত্রার বাড়িতেই যেতে পারি। আমার তো আর গীতাদি, কেয়া, মনুর মতো এক বাক্স সন্দেশ হাতে করে ঢোকার অভ্যেস নেই ... তাই কোথাও গেলে অসুবিধে হবে না। ..... আপাতত সে সিদ্ধান্ত স্থগিত রয়েছে।

পার্থসারথি ছাপা হয়ে আসবার পর আমার খুব হাসি পায়। দেখি Punctuation বলে কোনও বস্তু নেই। কোথাকার দাঁড়ি কোথায় ঝুলবে, তা ছাপা না হলে বোঝা সম্ভব নয়। যেমন গতবারে লিখেছিলাম – "মোটু ছে"; ছাপা হয়ে বেরোল "মোটু হে"। অবশ্য গত চার বছরে পাঠকবর্গও আমাকে চিনে গেছেন। প্রেসের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধেও বুঝে গেছেন। তাঁরা নিজের জ্ঞান প্রয়োগ করে বুঝে নেবেন, এই আমার বিশ্বাস।

রেখা এলো ..... প্রায় তিন মাসের মাথায় চলে গেল। যাবার আগে বলতে পারলো না, "I came, I saw, I conquerred"।

এখন একটা কথা বলি। অনেকে বলেন, "উনি একথা বলে গেছেন, ওকথা বলে গেছেন।" --- আমাকে বোকার মতো মুখ করে শুনে যেতে হয়। আমাকে তো

কিছু বলে যান নি! আমার আর তাঁদের কাছে উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে না যে শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে আমার একটা সাতপাকের সম্পর্ক ছিল। আমি এতো হড়বড় করি কেউ ভাবতেই পারেনা আমার অন্তরেও কিছু গোপন কথা সঞ্চিত আছে। তাই যাঁরা স্বামী গরবে গরবিনী, টাকার দেমাকে বড়বড় কথা বলেন, তাঁদের স্বামীটাই যে তাকে ছেড়ে অন্য নারীতে আসক্ত সেটা কি সুন্দর অব্যক্ত রেখে যান। আমি শুধু দেখেছি, শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে দু-একটা বাঁকা কথা বলেছি, বা রসিকতা করেছি, এখন straight উপেক্ষা করে যাই। যাক এসব অন্যের কথা। একথা ঠিক, নিজের স্বার্থ, কামনা-বাসনা-চাহিদা ছাড়া প্রায় কেউই শ্রীপ্রীতিকুমারকে আঁকড়ে ধরেন নি। তাই এখন তারা যদি শ্রীপ্রীতিকুমার "এই বলেছেন, ঐ বলেছেন" বলেন, আমি আয়নায় তাঁদের নিজের মুখ দেখতে বলি।

এবার আসি শ্রীপ্রীতিকুমারের কথায়। তাঁর চরিত্রটা ছিল ভীষণ আকর্ষণীয়। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থায়ও যখন তিনি ধুতি পাঞ্জাবী পরে হেঁটে যেতেন আমার ঐ বয়সেও কেমন একটা দোলা লাগতো। মুখে তাঁর কাছে স্বীকার করিনি আমার অভ্যাস ছিলনা বলে। অন্য মহিলাতো বটেই, বহু পুরুষও অতি সহজে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁকে একদিন না দেখলে কাতর হয়ে পড়তেন।

তিনি সকলকে বাড়িতে আসতে দিতেন না। কারণ ঐ গুজগুজ করে সম্পত্তির ব্যাপারে, বা শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সমালোচনা করা। ন্যাকা ন্যাকা কথা বলা আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না। বিপদে পড়লেই শ্রীপ্রীতিকুমার চেঁচিয়ে উঠতেন, "শুনছো? শুনছো? ওর এই সমস্যা ... কি করা যায়?" আমি কটমট করে

তাকাতেই পরিবেশটা স্তব্ধ হয়ে যেতো। তাঁরাও পড়িমড়ি করে তখনকার মতো বিদায় নিতেন।

তখন শ্যামবাজারে দর্শনার্থীদের আসা যাওয়ার কোনো Restriction ছিল না। ভদ্রলোকের চরিত্রটি বড় ভালো ছিল। শত চেষ্টা করেও আমি তাঁকে কোনদিন আক্রমণ করতে পারিনি। তাঁর মনে অশান্তি সৃষ্টি করবার জন্য হয়ত কোনও প্রতিপক্ষ খাড়া করেছি। ওমা, কয়েকদিন পরই দেখি আমার সেই প্রতিপক্ষ শ্রীপ্রীতিকুমারের একান্ত বাধ্য অনুগত হয়ে বসে আছে। তাঁর সেবা করছে।

যাক! যে মহীয়সীরা তাঁর কাছে আসতেন তাদের একজনের কথা আজ বলি। মেয়েটি খুব বড়লোকের মেয়ে, আদুরে। কিন্তু বিয়ে করেছিল একটি সাধারণ ছেলেকে। ছেলেটির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকায় মেয়েটির বাবা তাকে একটি বাড়ি দিয়েছিলেন। তার ফলে নিজের ভাইদের কাছে মেয়েটি অপ্রিয় হয়ে যায়। শ্রীপ্রীতিকুমার মেয়েটিকে খুব স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে সে আমাদের বরানগরের বাড়িতে চলে আসতো। তার স্বামীও সঙ্গে আসতো কখনও কখনও। স্বামীর চাকরী করবার মানসিকতা একেবারেই ছিলো না। মেয়েটির ভাই বা জামাইবাবু তাকে একটি করে চাকরী জোগাড় করে দিতেন, ছেলেটি দুদিন পরই চারী ছেড়ে বাড়ী এসে বসে থাকতো। প্রায়ই মেয়েটিকে pressure দিত বাপের বাড়ী থেকে আরও সম্পত্তি আদায় করবার জন্য। মেয়েটি উত্যক্ত হয়ে শ্যামবাজারে চলে আসতো। শেষে বরানগরে আসা ধরেছিল। একদিন আমার কলেজে যাবার মুহূর্তে সে এসে হাজির। আমি বললাম, "একটি মানুষের তো Rest দরকার। তোমরা সমস্যাগুলি শ্যামবাজারে গিয়ে তো বলতে পারো? এটা তো সমস্যা সমাধানের জায়গা নয়!" সে বলে উঠলো, "আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, প্রীতিদা'র কাছে আমি আসবই।"

DO NOT COPY

আমি বললাম, “যত ইচ্ছে আসো, কিন্তু এখানে এসে তোমাদের ওসব সমস্যা নিয়ে ওঁকে বিব্রত কোর না।” কয়েকদিন পর মেয়েটির আবার আগমন। সেই একই নালিশ স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আমার আর সহ্য হল না। বলে ফেললাম, “রোজ এসে প্যানপ্যান কর কেন? স্বামীর মার খাবার দিন তো নেই। একবার মার খেলে ফিরে মারবার অভ্যাস কর।” ঠিক তার দুদিন পর শ্রীপ্রীতিকুমার বাড়ীতে এসেই শুরু করলেন, “কোথায় গেলে? কোথায় গেলে?” দৌড়ে এলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, “মেয়েটিকে কি শিক্ষা দিয়েছ? আজ তো ওর স্বামীকে আচ্ছা করে মার দিয়ে শ্যামবাজারে পালিয়ে এসেছে। তোমার Instruction অনুযায়ী কাজ করে এখন ঠ্যালা সামলাও!” – আমি আশ্বস্ত হলাম। স্বামীর অত্যাচার এবার বন্ধ হতে পারে। হয়েছিল। স্বামী অবশ্য অন্যপথ ধরেছিলেন। মেয়েটি যেই বলতো সে পৃথকভাবে বসবাস করবে, স্বামীটি দেওয়ালে মাথা কুটে – মাথা ফাটিয়ে রক্তকাণ্ড করে ফেলতো।

আমরা দমদমে আসবার পর মেয়েটি একদিন মাত্র এ বাড়িতে এসেছিল। শেষ যেদিন সে এসেছিল, আমার মনে পড়ে, শ্রীপ্রীতিকুমার সোফায় বসেছিলেন। মেয়েটি হাঁটু মুড়ে শ্রীপ্রীতিকুমারের পায়ের কাছে বসে পড়ে। শ্রীপ্রীতিকুমার অনেকক্ষণ ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমার মনে হয় যে শ্রীপ্রীতিকুমার বোধ হয় জ্ঞাতসারে মেয়েটিকে শেষবারের মতো আশীর্বাদ করেছিলেন।

তারপর মেয়েটির সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। জানিনা সে কেমন আছে। তবে আমাদেরই খুব ঘনিষ্ঠ একজনের সাথে তার দেখা হয়েছিলো। সে বলেছিল, শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার অনেক পরে সে খবর পায় কোনও পুরনো খবরের কাগজের মাধ্যমে। কিন্তু তখন এতো দেরি হয়ে গেছে যে সে তারপর আর আমার

DO NOT COPY

কাছে এসে দাঁড়াতে পারেনি। আমার কিন্তু এখনও মেয়েটির কথা মনে পড়ে। দেখা হলে তাকে কি অবস্থায় দেখব জানি না। একটা কথা জানতে ইচ্ছে ছিল সে যে ঘটনাগুলি ঘটবে না বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল, সেই ঘটনাগুলি সাধারণ লোকের মাধ্যমে আমাদের জীবনে ঘটলো কেন? এই উত্তরটা সে দিতে পারতো। কারণ শ্রীপ্রীতিকুমারের জীবিত কালের শেষ ভাগের সব খবরই সে জানতো। ----

- - - - - - - -

(** রচনাকাল - ডিসেম্বর, ১৯৯০)

রাজযোগ **শ্রী অরবিন্দ**

হঠযোগের সমস্ত বদ্ধ ঘরের চাবী যেমন দেহ এবং প্রাণ, তেমনি রাজযোগের চাবী মন। এই দুইটি যোগ-পদ্ধতিতে মন এবং প্রাণ যে দেহের উপর নির্ভর করে তা স্বীকৃত হয়েছে; হঠযোগ পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে, আর রাজযোগের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে আংশিকভাবেই দেহের উপর নির্ভর করা হয়েছে। সুতরাং এই দুই পদ্ধতিতেই আসন এবং প্রাণায়ামকে অভ্যাসের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। হঠযোগে আসন প্রাণায়ামই সমস্ত ক্ষেত্র অধিকার করে আছে, কিন্তু রাজযোগে উহারা এক সাধারণ পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়েছে মাত্র, এবং তাদের সম্মিলিত অভ্যাস একটি সীমাবদ্ধ মধ্যবর্ত্তী উদ্দেশ্য সাধন করে মাত্র। মানুষ দেহধারী আত্মা, তথাপি তার পার্থিব প্রকৃতিতে সে দৈহিক এবং প্রাণিক জীব, আর প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মানুষের মানসিক ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণ রূপে তার দেহ এবং স্নায়ুমণ্ডলীর উপর নির্ভর করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এবং মনোদর্শন কিছুকাল এমন মতবাদও পোষণ করেছে যে

DO NOT COPY

ঐ নির্ভরতা এসেছে প্রকৃতপক্ষে দেহ-মন-প্রাণের একত্ব থেকেই। প্রমাণ করবার প্রয়াস হয়েছে যে মন অথবা আত্মারূপ কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নাই, এবং সকল মানসিক ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে দৈহিক বৃত্তি। ঐ মতবাদ অগ্রাহ্যনীয়, কিন্তু ঐ নির্ভরতাকে এতো বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে লোকের ধারণা হবে উহা একটি বাধ্যতামূলক শর্ত। মন যে প্রাণ ও দেহের ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, অথবা ঐ সব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে এই সত্য বহুকাল যাবৎ ভ্রমাত্মক রূপেই পরিগণিত হয়েছে এবং উহাকে মনের অসুস্থতা অথবা মোহের অবস্থা বলা হয়েছে। সুতরাং দেহের উপর মনের নির্ভরতাই চরম সত্য রয়ে গেছে। বিজ্ঞানও নির্ভরতার প্রকৃত চাবী খুঁজে পায়নি এবং পেতেও চায় নি। সুতরাং বিজ্ঞান দেহের উপর নির্ভরতা থেকে আমাদিগকে মুক্তি অথবা প্রভুত্ব দেবার কোনও গুপ্ত মন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি।

যোগের মানস-দৈহিক বিজ্ঞান ওরূপ ভুল করে না। যোগ চাবীর অনুসন্ধান করে তাকে আবিষ্কার করে এবং মনকে মুক্তিদান করতে সক্ষম হয়। কারণ যোগ পশ্চাতে স্থিত আত্মিক ও মানসিক দেহের সংবাদ লয়, আমাদের এই স্থূল দেহ ঐ দেহের বাস্তব পুনরুৎপাদন মাত্র। যোগ বিজ্ঞান স্থূল দেহেরও এমন সব গুহ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করে যা জড় বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। ঐ মানসিক বা আত্মিক দেহকে আত্মা মৃত্যুর পরেও রক্ষা করে। ঐ দেহেরও সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি আছে যা আত্মার সূক্ষ্ম প্রকৃতি এবং স্থূল তত্ত্বের অন্তর্গত। কারণ যেখানেই কোনও একরূপে প্রাণ বিরাজ করে সেইখানেই প্রাণিক শক্তি এবং পদার্থ থাকবেই যার মধ্যে প্রাণ কাজ করে। ঐ শক্তি বিভিন্ন গতিপথে চালিত হয় যাদিকে নাড়ী বলা হয়, -- আত্মিক দেহে ঐ নিয়ন্ত্রণ সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত। ঐ সব নাড়ী ছয়টি, প্রকৃতপক্ষে সাতটি কেন্দ্রে

সংগৃহীত। যোগশাস্ত্রে ইহাদিকে পদ্ম বা চক্র বলা হয়। এরা একটির ঊর্দ্ধে আর একটি এইরূপে অবস্থান করে। সর্বোপরি আছে সহস্রদল পদ্ম যেখান থেকে সকল মানসিক এবং প্রাণিক শক্তি প্রবাহিত হয়। ঐ পদ্ম সকলের প্রত্যেকটি নিজস্ব বিশেষ শক্তি ও ক্রিয়া কর্মের কেন্দ্র বা ভাণ্ডার - উহাদের প্রত্যেকটির বিধিবদ্ধ ক্রিয়া আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বের সহিত সংযুক্ত। উহাদের শক্তি নাড়ী সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যাবর্তন করে প্রাণশক্তির প্রবাহের মধ্যে।

আত্মিক দেহের এই ব্যবস্থিতি স্থূল দেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়; মেরুদণ্ড হয় থাম, স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রগুলি হয় এক একটি চক্র যাদের সর্ব নিম্নটি মেরুদণ্ডের নিম্নস্থলের সহিত যুক্ত থাকে এবং ঐখান থেকে আরম্ভ করে মগজ পর্যন্ত উত্থিত হয়, পরে করোটির শীর্ষদেশে স্থিত তাদের সর্বোচ্চ স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রের সহিত সংযুক্ত থাকে। পরন্তু, এই সমস্ত চক্র বা পদ্ম মানুষের বাস্তব দেহে নিমীলিত অথবা অর্ধ উন্মীলিত থাকে। তার ফলে বাস্তব জীবনের জন্য যে শক্তি যতটুকু পরিমাণে আবশ্যক হয় শুধু সেইটুকুই ক্রিয়াশীল থাকে, এবং মন ও আত্মার খেলাও ঐ আবশ্যকতা অনুযায়ী হয়। যান্ত্রিক দিক থেকে দেখলে ইহাই কারণ যার জন্য দেহস্থ আত্মা দৈহিক এবং স্নায়বিক জীবনের অধীন রূপেই প্রতীয়মান হয় - যদিও এই অধীনতা যতখানি মনে হয় ততখানি সম্পূর্ণ বা প্রকৃত নয়। আত্মার সমগ্র শক্তি বাস্তব দেহে এবং প্রাণে সক্রিয় নয়। মনের গুহ্য শক্তি ও হেথায় জাগ্রত নয়, দেহ এবং স্নায়ুমণ্ডলীই আধিপত্য করে। কিন্তু সর্বদা পরমশক্তি দেহের মধ্যে নিদ্রিত রয়েছে। এই শক্তি সর্পের ন্যায় কুণ্ডলিত অবস্থায় সর্ব নিম্ন চক্রে, মূলাধারে সুপ্ত আছে তাই ইহাকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলা হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা যখন এই দেহস্থ ঊর্দ্ধমুখী ও নিম্নগামী প্রাণ প্রবাহের বিভেদ দূর করা হয়, তখন এই কুণ্ডলিনী আঘাত প্রাপ্ত হয়ে জাগরিত হয়, আপনাকে কুণ্ডল বিমুক্ত করে এবং ঊর্দ্ধদিকে অগ্নিময় সর্পের ন্যায় প্রত্যেকটি পদ্মকে প্রস্ফূটিত করতে করতে উত্থিত হতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত এই শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রেস্থিত পুরুষের সহিত গভীর সমাধির মিলনে সংযুক্ত হয়।

DO NOT COPY

সাধারণ ভাবে, দার্শনিকের অগভীর ভাষায় ইহার অর্থ এই যে আমাদের সত্তার প্রকৃত শক্তি অচেতন অবস্থায় আমাদের প্রাণবীয় পদ্ধতির গভীরে সুপ্তিময় আছে এবং তাকে প্রাণায়ামের সাহায্যে জাগরিত করা যায়। বিকশিত হয়ে এই শক্তি আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সব কয়টি কেন্দ্রকে করে উন্মুক্ত; ঐ সব কেন্দ্রে আমাদের সেই সত্তার শক্তি এবং চেতনা বাস করে, সে সত্তাকে আমরা হয়ত প্রচ্ছন্ন সত্তারূপে অভিহিত করবো। চেতনা এবং শক্তির এক একটি কেন্দ্র যেমন খুলতে থাকে, আমরাও পরের এক একটি মনস্তাত্ত্বিক স্তরের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করি, এবং ঐ সব স্তরের সহিত সংযুক্ত আমাদের সত্তার জাগতিক এবং বিশ্বগত অবস্থার সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারি। চেতনার যে সমস্ত শক্তি বাস্তব মানুষের কাছে অসাধারণ হয়ে আছে অথচ যারা আত্মার স্বাভাবিক শক্তি তা সব আমাদের মধ্যে বর্ধিত হতে পারে। সর্বশেষে ঊর্দ্ধগতির সর্বোচ্চশিখরে এই সুপ্তোত্থিত বিকাশমান শক্তি মানসাতীত সত্তার সহিত মিলিত হয়। এই সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের বাস্তব এবং মানসিক অস্তিত্বের পিছনে অবস্থিত। এই সাক্ষাৎকারের পরিণতি হয় মিলনের গভীর সমাধিতে যেথায় আমাদের জাগ্রত চেতনা অতিচেতনায় নিমজ্জিত হয়। এই ভাবে প্রাণায়ামের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসের দ্বারা হঠযোগী সেই সব আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক ফল লাভ করে যার জন্য অন্যান্য যোগ পন্থায় আরও প্রশস্ত আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুসরণ করে। একটিমাত্র মানসিক সাহায্য যা হঠযোগী তার পদ্ধতিতে সংযুক্ত করে তা হল ইষ্টমন্ত্র, কোনও একটি পবিত্র শব্দ, নাম অথবা আধ্যাত্মিক সঙ্কেত যার ভারতীয় যোগ সাধনায় বিশেষ প্রাধান্য আছে এবং যা সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। মন্ত্রশক্তির এই গুহ্যতত্ত্ব ছয়টি চক্র এবং কুণ্ডলিনী শক্তিই হোল জটিল মানস দৈহিক বিজ্ঞানের এবং সাধনার কেন্দ্রিক সত্য। তন্ত্র দর্শন দাবী করে যে ঐ বিজ্ঞান এবং সাধনা আমাদিকে দেখিয়ে উহা একটি যুক্তিসঙ্গত এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি দান করেছে। ভারতের সকল ধর্ম এবং অনুশাসন যা প্রধানতঃ মানস দৈহিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা অল্পাধিক ভাবে ঐ সকলের সাহায্য গ্রহণ করে।

রাজযোগেও প্রাণায়াম ব্যবহৃত হয় হঠযোগের ন্যায় একই প্রধান মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজযোগ বিশেষভাবেই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি সুতরাং ইহার ধারাণুক্রমিক সাধনাভ্যাসের একটি বিশেষ অবস্থায় সীমাবদ্ধভাবেই প্রাণায়াম ব্যবহৃত হয়, তিন চারটি বৃহত্তর উপকারীতার জন্য। আসন এবং প্রাণায়াম নিয়ে রাজযোগের আরম্ভ নয়, প্রথমে মনের নৈতিক পবিত্রতার উপর জোর দেওয়া হয়, ঐ প্রাথমিক ক্রিয়া বিশেষভাবেই আবশ্যক। ঐ পবিত্রতা না থাকলে রাজযোগের পরবর্ত্তী অবস্থায় বিভ্রাট ও বিঘ্নের উৎপত্তি হয় এবং অপ্রত্যাশিত মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক বিপত্তিতে পূর্ণ হয়। রাজযোগের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির নৈতিক পবিত্রীকরণের পদ্ধতির দুইটি বিভাগ আছে, পাঁচটি সংযম আর পাঁচটি নিয়ম। প্রথমটি আচার ব্যবহারে নৈতিক সংযম সম্বন্ধে যথা সত্য ভাষণ, অপরকে আঘাত বা হত্যা করা থেকে, চৌর্য্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইগুলিকে দেখতে হবে নৈতিক আত্মসংযম এবং পবিত্রতার জন্য প্রয়োজনীয় কেবল মাত্র কয়েকটি প্রধান নিদর্শন মাত্র এইরূপে। বিশদভাবে সংযম হোল যে কোনও আত্মনিয়ন্ত্রণ যার সাহায্যে মানুষের মধ্যে রাজসিক অহমিকা এবং তাহার বাসনা কামনাকে জয় করে পরিপূর্ণ বিরতির মধ্যে তাদিকে প্রশমিত করা হয়। নৈতিক শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং কামনা শূন্য হওয়াই লক্ষ্য যাতে রাজসিক মানুষের মধ্যে অহমিকার মৃত্যু হয়। নিয়ম হোল নানা রকম অভ্যাসের দ্বারা মানসিক নিয়ন্ত্রণ সাধন। দিব্যসত্তার ধ্যানই সর্ব্বোচ্চ সাধন। এবং এইসব অভ্যাসের লক্ষ্য সাত্ত্বিক নিশ্চলতা ও পবিত্রতার সৃষ্টি করা এবং সেই একাগ্রতার প্রস্তুতি করা যার উপর যোগের পরবর্ত্তী সাধনগুলি সম্পাদিত হবার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ঐ অবস্থায় যখন ঐ ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তখনই আসন এবং প্রাণায়াম অভ্যাসের সময় আসে এবং পূর্ণভাবে ফলপ্রদ হয়। মানসিক ও নৈতিক সংযম আমাদের সাধারণ চেতনাকে উপযুক্ত প্রাথমিক অবস্থায় স্থাপিত করে মাত্র। যোগের বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় চৈত্য পুরুষের যে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তা সম্পাদিত করতে পারে না। ঐ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন আমাদের বর্ত্তমান প্রাণিক

ও দৈহিক সত্তার সহিত মনের গ্রন্থিকে উন্মোচিত করা এবং উচ্চতর চৈত্যপুরুষের মাধ্যমে অতিচেতনময় পুরুষের সহিত যুক্ত হবার জন্য ঊর্ধগতির পথকে পরিষ্কার করা। প্রাণায়ামের দ্বারা তা হতে পারে। রাজযোগে কেবলমাত্র সব থেকে সহজ এবং স্বাভাবিক আসনগুলিই গ্রহণ করা হয়, যে সবকে আমাদের দেহ আপনা থেকেই গ্রহণ করে, যখন স্থির হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে উপবেশন করা হয়। তবে পৃষ্ঠদেশ এবং মস্তক নিখুঁত ভাবে সোজা রাখতে হয়, যাতে মেরুদণ্ডে কোনরূপ বক্রভাব না থাকে। এই শেষোক্ত নিয়মটি ছয়টি চক্রের নীতির সহিত যুক্ত, উহাতে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রাণশক্তি সঞ্চালনের সুবিধা হয়। রাজযৌগিক প্রাণায়াম স্নায়ুমণ্ডলীকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করে। ইহার সাহায্যে আমরা প্রাণশক্তিকে সমান ভাবে দেহের মধ্যে সঞ্চালিত করতে পারি এবং আমাদের প্রয়োজনীয় স্থানে চালাতে পারি এবং এইরূপে দেহ ও প্রাণের স্বাস্থ্য এবং শক্তি অক্ষুন্ন রাখতে পারি। ইহার দ্বারা আমরা দেহস্থ পাঁচটি প্রাণশক্তির অভ্যাসগত কার্য্যের উপর আধিপত্য লাভ করি এবং একই সময়ে ইহাদের অভ্যস্ত বিভেদও ভেঙ্গে দিতে পারি যার দ্বারা সাধারণ জীবমে প্রাণশক্তির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া সকল সম্ভব হয়। প্রাণায়াম ছয়টি চক্রের মানস দৈহিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে এবং ঊর্দ্ধগতির প্রতিটি স্তরে আমাদের জাগ্রত চেতনায় নিয়ে আসে সুপ্তোত্থিত শক্তির ক্ষমতা ও অনাবৃত পুরুষের আলো মন্ত্রের সহিত ব্যবহৃত হয়ে প্রাণায়াম দেহের মধ্যে দিব্য শক্তিকে নিয়ে আসে এবং সমাধির মধ্যে সেই একাগ্রতা আনাকে সহজসাধ্য করে এবং নিয়ে আসে যা রাজযোগ পদ্ধতির সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

রাজসিক একাগ্রতা চার ভাগে বিভক্ত; আরম্ভে ইহা মন আর ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বস্তু থেকে ফিরিয়ে আনে; তারপর অন্যান্য ধারণা বা মানসিক ক্রিয়া কর্মকে বর্জন করে একটিমাত্র বিষয়বস্তুতে একাগ্র চিত্ত হয়। পরে ঐক্যের বস্তুতে মনকে দীর্ঘকাল মনকে নিমজ্জিত রাখে। শেষে চেতনাকে সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করে যাতে সমাধির একত্মে সর্বরকমের বাহ্যিক মানসিক ক্রিয়া অবলুপ্ত হয়। এই মানসিক অনুশাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মনকে বাহ্য এবং মানসিক জগত থেকে সরিয়ে

এনে তাকে দিব্য সত্তার সহিত মিলিত করা। সুতরাং প্রথম তিনটি অবস্থায় কোনও একটি মানসিক পন্থা বা অবলম্বন ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ছুটে বেড়াতে অভ্যস্ত মনকে একটিমাত্র বস্তুতে নিবদ্ধ করা যায়, এবং সেটি হবে এমন বস্তু যা ভগবৎ ধারণার প্রতিরূপ। সাধারণতঃ ঐ বস্তু হয় একটি নাম বা রূপ অথবা মন্ত্র যার সাহায্যে চিন্তাকে একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞান বা আরাধনায় নিবদ্ধ করা হয়। ভগবৎ চিন্তায় এই একাগ্রতার দ্বারা মন মানসিক ধারণা থেকে সত্যে উপনীত হয়। তারই মধ্যে সে ডুবে যায়, অবলুপ্ত হয়, তার সাথে মিলে এক হয়ে যায়। ইহাই রাজযোগের চির আচরিত পদ্ধতি। অন্যসব পদ্ধতিও আছে যা রাজযোগের পন্থার অনুরূপ। কারণ সেখানেও মানসিক এবং আত্মিক সত্তাকে চাবী স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি পদ্ধতিতে মনকে শান্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়, বিমর্ষিত করা নয়। ঐ সব নিয়মানুসারে মনের ক্রিয়াকর্মকে শুধু লক্ষ্যই করা হয়, এবং মনকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় তার চঞ্চল উদ্দেশ্যহীন চিন্তার পথে ধাওয়া করার অভ্যাসকে ক্লান্ত করে আনতে; মন শেষ পর্যন্ত বোধ করে যে তার ঐ ধরণের গতি বিধিতে আত্মার অনুমোদন, উদ্দেশ্য বা আগ্রহ নাই। আর একটি পদ্ধতি আছে তা অধিকতর কঠিন এবং ফলদায়ক। ইহাতে বহির্মুখী সকল চিন্তাকে বর্জন করা হয়, এবং মন বাধ্য হয় নিজের মধ্যে ডুবে যেতে; সেথায় তার নিজস্ব পরম স্থিরতার মধ্যে সে পবিত্র সত্তাকেই প্রতিবিম্বিত করতে পারে অথবা অতিচেতনার অস্তিত্বে উত্থিত হয়। পদ্ধতির ভেদাভেদ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য এবং ফল সর্বত্রই সমান।

বলা যেতে পারে যে এইখানেই রাজযোগের পরিসমাপ্তি। কারণ ইহার লক্ষ্য চেতনার সকল তরঙ্গকে; তার বহুমুখী ক্রিয়াকে, চিত্তবৃত্তিকে প্রশমিত করা। প্রথমত আলোময় শান্ত সাত্ত্বিক ক্রিয়া অভ্যাসগত আবিল রাজসিক ক্রিয়া কর্মের স্থান গ্রহণ করে পরে সব রকমের ক্রিয়াকর্মই স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজযোগের প্রধান উদ্দেশ্য হোল আত্মার নীরবতার প্রবেশ করা এবং ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করা। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় রাজযোগ পদ্ধতিতে অন্য সব লক্ষ্যও আছে। যথা - অলৌকিক শক্তির সাধন এবং প্রয়োগ। এই সব লক্ষ্যের কয়েকটিকে রাজযোগের প্রধান

উদ্দেশ্যের সহিত সম্বন্ধহীন এমন কি তার পরিপন্থী মনে হয়, ঐ সমস্ত শক্তি এবং সিদ্ধাই যে বিপজ্জনক প্রায়ই তা ঘোষণা করা হয়; ইহারা যোগীকে তার একমাত্র ন্যায্য লক্ষ্য ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। যোগমার্গে ঐসব শক্তিকে পরিত্যাগ করাই আবশ্যক এরূপ মনে হওয়ায় স্বাভাবিক; আর একবার চরম লক্ষ্যে উপনীত হলে ঐ সব শক্তিকে তুচ্ছ এবং অনাবশ্যকই মনে হয়। রাজযোগ আত্মিক বিজ্ঞান, সুতরাং চেতনার উচ্চতর অবস্থা এবং শক্তি লাভ করা ইহার লক্ষ্যের মধ্যেই পরিগণিত হয়। ঐ সব শক্তির সাহায্যে মনোময় সত্তা অতিচেতনাতে উত্থিত হয় এবং উহার সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা পরমাত্মমের সহিত মিলন; তাহাও সম্পন্ন হয়। অধিকন্তু যোগী যতদিন দেহে আছেন ততদিন তিনি মানসিকভাবে সর্বদা নিষ্ক্রিয় বা সমাধিস্থ থাকেন না। সুতরাং উচ্চতর শক্তি এবং অবস্থা যা তার সত্তার উচ্চতর স্তরে তার পক্ষে লাভ করা সম্ভব তা সবের সন্ধান লওয়া তাঁর বিজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন।

ঐ সব শক্তি এবং অভিজ্ঞতা আমাদের বাসস্থল এই বাস্তব জগতের উর্ধে স্থিত প্রাণ এবং মন জগতের অন্তর্ভূক্ত; আমাদের আত্মার সূক্ষ্ম দেহের পক্ষে তারা স্বাভাবিক; স্থূল দেহের উপর নির্ভরতা যখন কমে আসতে থাকে ঐ সমস্ত অসাধারণ শক্তিসমূহের ক্রিয়াও তেমনি সম্ভব হতে থাকে, এমন কি অযাচিতভাবেই তারা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী তাদিকে অর্জন এবং নিরূপন করা যায়। তখন তাদের ব্যবহার আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ হয়ে পড়ে; অথবা আমরা তাদিকে স্বেচ্ছায় বর্ধিত হতে দিতে পারি। ঐ সব শক্তি যখন উদয় হয় তখন তাদিকে ব্যবহার করতে পারি। অথবা যখন আমাদের অন্তরস্থ দেবতা তাদিকে ব্যবহার করার নির্দেশ দেন তখন, অন্যথা যদিও তারা স্বাভাবিক ভাবেই কাজ করে এবং বর্ধিত হয় তথাপি তাদিকে বর্জন করা হয় যোগের একমাত্র পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার একচিত্ত ও ভক্তির প্রেরণায়। আরও পূর্ণ এবং বৃহত্তর শক্তি সকল আছে যারা অতিমানসিক স্তরের অন্তর্গত যারা প্রকৃতই ভগবানের আধ্যাত্মিক এবং অতি মানসিক জ্ঞান সত্তার শক্তি ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা স্থায়ী ভাবে বা সম্পূর্ণরূপে ঐ সমস্ত শক্তি আদৌ লাভ

করা যায় না; তারা উপর থেকেই আসতে পারে, অথবা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে তখনই যখন মানুষ মনের উপরে ওঠে এবং আধ্যাত্মিক সত্তায়, শক্তিতে, চেতনায় এবং চিন্তায় বাস করে। ঐ সব শক্তি অবতরণ করে অপ্রাকৃত এবং শ্রমে লব্ধ সিদ্ধির মত নয়, কিন্তু অতি সাধারণভাবে মানুষের কাজের নিজস্ব প্রকৃতি এবং পদ্ধতি স্বরূপ হয়ে, যদি সে জগত জীবনে তখনও কর্মশীল হয়ে বাস করে।

আমাদের পূর্ণযোগের জন্য রাজযোগ এবং হঠ যোগের বিশেষ পদ্ধতিগুলি সাময়িকভাবে এবং বিশেষ কোন অবস্থায় উপযোগী হতে পারে। কিন্তু ওসব অপরিহার্য্য নয়। ইহা সত্য যে ঐ দুই যোগের প্রধান লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণ যোগের অঙ্গ স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে; কিন্তব অন্য সব উপায়েও ঐ সব লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। পূর্ণ যোগের পদ্ধতি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, সুতরাং দৈহিক পদ্ধতি থবা নির্দিষ্ট মানস-দৈহিক ক্রিয়া কর্মের উপর অত্যাধিকরূপে নির্ভর করলে তা হবে উচ্চতর ক্রিয়ার স্থলে নিম্নতরকে গ্রহণ করা। এই বিষয়ের সমালোচনা আমরা পরে করবো যখন আমরা যোগ সমণ্বয়ের শেষ নীতিতে আসবো। বিভিন্ন বিভিন্ন যোগ পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ঐ চরম যোগ সমন্বয়ে আসা।

*** (The Synthesis of Yoga)

“মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিনি, নৃমুণ্ডমালিনি, দিগম্বরি, কৃপাণপাণি, দেবি অসুরবিনাশিনি! ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে। বিমল নির্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা। মাতঃ, প্রকাশ হও।”

- - **শ্রীঅরবিন্দ**

DO NOT COPY

স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচৈতন্য প্রণতি **ডঃ রুহিদাস সাহা**

শ্রীচৈতন্যের অনেক নাম – নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌর, গৌরহরি, গৌরাঙ্গ, গৌর সুন্দর, গৌরাঙ্গ সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু, আরও কতো কি! বহু বিশেষণেও তিনি বিশেষিত, যেমন, পতিতপাবন, অধমতারণ, ভক্তবৎসল, নদীয়াবিহারী, বিপ্লবী পুরুষ, সংগ্রামী পুরুষ, অখণ্ড অমিয়। প্রতিটি নাম, প্রতিটি বিশেষণই শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তের অকৃত্রিম ভক্তি ভালবাসার প্রতীক। এই ভক্তি ভালোবাসা সত্যিই অপরিসীম, অবশ্যই প্রাচুর্য্যে ভরা। ভক্তদের অনুসরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দও প্রাণের পরশে এক স্থানে শ্রীচৈতন্যকে সম্বোধন করেছেন 'নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে। অন্য এক স্থানে তিনি শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বলেছেন, 'সমগ্র ভারতে শক্তি-সঞ্চারকারী আর্য্যাবর্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি যথার্থই – শ্রীচৈতন্য 'সমগ্র ভারতে শক্তি সঞ্চারকারী'। অবশ্যই শ্রীচৈতন্য তাঁর সাম্য-প্রেম-মৈত্রী ভিত্তিক উদার মানবধর্ম দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে সারা ভারত পদব্রজে পরিক্রমা করেছেন যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে। গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-আসাম-মিথিলা-মথুরা-বৃন্দাবন-দ্রাবিড়-গুজরাট সহ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত করেছেন। এরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি লিখেছেন - 'সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।' যেখানেই লোক ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদীয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

এখানে বিবেকানন্দ 'শিষ্যগণ' বলতে শ্রীচৈতন্য ভক্তদেরই বুঝিয়েছেন বলে মনে করা সঙ্গত এই কারণে যে, শ্রীচৈতন্য কাউকে শিষ্য করেন নি কোনোদিন। আর সকল ভক্তই যে সারা ভারতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের কথা জানতেন না একথাও সম্ভবতঃ বিবেকানন্দ বলতে চান নি, তবে অধিকাংশ ভক্ত যে এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর জন্যে বিবেকানন্দের এই উক্তিতে তাঁর ক্ষোভ আর বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে। অন্য দিকে সর্বত্র শ্রীচৈতন্য-ধর্মের প্রসারে তিনি আনন্দিতই হয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী জাতীয় জীবনে এক নব জাগরণের যুগ। এই নবজাগরণ মূলতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামকেন্দ্রিক হলেও সর্বদিকেই এই নবজাগরণের পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল। তখন স্বাদেশিকতার বন্যা বয়ে গিয়েছিল। প্রতি ক্ষেত্রেই জন্ম নিয়েছিলেন বহু মনীষী। নব জাগরণের মধ্য দিয়ে বহু মনীষীর জন্মের ক্ষেত্র যেন প্রস্তুত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের মতবাদ মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক হলেও তাঁর সর্বব্যাপী চিরকালীন মতবাদে পুষ্ট সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত জগতেও বহু মনীষী জন্মলাভ করলেন। সব মিলিয়ে চৈতন্য-চিন্তার তখন জয় জয়কার। এই দৃশ্য দেখে স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দিতই হয়েছিলেন। তারই প্রকাশ তাঁর এই উক্তিতে – "ক্রমশঃ রূপ-সনাতন, জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরভ্যুত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে।"

শ্রীচৈতন্যের মানব-ধর্ম প্রসারে স্বামী বিবেকানন্দ যে খুশী হতেন তা তাঁর আশার বাণী থেকেও স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন – "আশা করি উহা শীঘ্রই আপন সুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।"

শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মুগ্ধ। বিবেকানন্দ একস্থানে লিখেছেন – "শ্রীচৈতন্য ব্যাসসূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়াছে, না হয় এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। "

শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্যে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিবেকানন্দ লিখেছেন –"দুঃখের বিষয় বেদের চর্চায় বঙ্গবাসীর যত্ন ছিল না; এমন কি কয়েক বর্ষ মাত্র পূর্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পড়াইতে পারেন এমন কেহ বঙ্গদেশে ছিলেন না বলিলেই হয়। একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন – ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল; কিছু দিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় – শ্রীচৈতন্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 'ভগবান'। শ্রীচৈতন্যকে ভগবান জ্ঞানেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি বিভিন্ন স্থানে। অন্য এক স্থানে বিবেকানন্দ লিখেছেন – "আমি এক্ষণে এই আর্য্যাবর্ত নিবাসী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতেছি।"

তারপর তিনি যে ভাষায় শ্রীচৈতন্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা যেমন সহজ সরল, তেমনই তাতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসীম চৈতন্য-ভক্তি, সে ভক্তিতে কোন কৃত্রিমতা নেই, ভাষায় কোন চাতুর্য্য নেই, প্রাণের পরশে তা প্রাণবন্ত, সাবলীল, প্রতি ছত্রে যেন চৈতন্য ভক্তির স্রোত প্রবাহিত, সে স্রোত বেগবতী, প্রাণবন্ত। তিনি লিখেছেন – "জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য্য আসিয়াছেন, এই প্রেমোন্মাদ ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবই তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতম ছিলেন। তিনি ভগবান হইয়াও আচার্য্যের ধর্ম পালন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলেরই প্রাণে শান্তি দিয়াছে। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। তাই সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার অমর কীর্ত্তি হইয়াছে ও হইবে। তিনি সাধু, অসাধু, পাপী, পুণ্যবান, হিন্দু, মুসলমান, পবিত্র, অপবিত্র, পতিত, এ জাতি, সে জাতি, এ দেশ, সে দেশ, এই সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায় কোন ভেদবুদ্ধি করেন নাই, সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিলেন। সকলকেই তিনি অকাতরে দয়া করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত এই সম্প্রদায় দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, মূর্খ, অধম, পাপী, দুর্গত, কোন সমাজে যাহার স্থান নাই, এইরূপ সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল। ইহা কতো বড় উদার

কথা। আজ পর্যন্ত কোন হিন্দু আচার্য্যই এরূপ আচরণ করেন নাই। সকলের মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়। তাঁহার শিক্ষাই সমগ্র মানব জাতির শিক্ষণীয়। তাঁহার কার্য্যের সহায়তা যাহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও এক একজন মহান আদর্শ পুরুষ ছিলেন এবং প্রেমধর্ম প্রচারের পূর্ণ অনুকূল ছিলেন। তাই জগত আজ সেই পরজগতের সুবিমল প্রেম-ধর্মের অনুসন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছেন এবং হইবেন।

অর্থনৈতিক ভাবে দরিদ্র যারা সমাজে তারা দুর্বলশ্রেণী। দারিদ্র্য দরিদ্রের অপরাধ নয়, এটা একটি সামাজিক অপরাধ, কারণ সামাজিক শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দারিদ্র্য সৃষ্টি। মূর্খতাও দারিদ্র্যসঞ্জাত। আর হিন্দু সমাজে কাউকে জাতিচ্যুত ও পতিত আখ্যা দেওয়া হয় তো খুব সহজেই। সেই তথাকথিত জাতিচ্যুতকে, পতিতকে যে ধর্ম আপন করে নেয়, যে ধর্ম দুর্গতকে স্থান দেয়, সে ধর্মই তো প্রকৃত ধর্ম। যে ধর্ম পাপীকে ঘৃণা করতে শেখায় না, বরং পাপীকে নিজের কোলে স্থান দিয়ে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে শেখায় সেই ধর্মের তো তুলনা হয় না। ধর্মের সেই উদারতারই প্রশস্তি গেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি সেই উদার মতাদর্শের প্রবক্তাপুরুষ তাঁর ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে।

"যাহা সত্য বলিয়া জানিব, তাঁহার জন্য জীবনপণ করিব। আর যাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিব, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব – এইরূপ দৃঢ় মনোবল প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়।"

--- স্বামী প্রণবানন্দ

DO NOT COPY

ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণ-যোগ্য, পরীক্ষণ-যোগ্য ও যাচাই-যোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান। সরল বাঙলায় বলতে গেলে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নানা উদাহরণ দিয়ে এই কথাটি বলেছেন। "অনেক জানার নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর রয়েছেন – এর নাম জ্ঞান। তাঁকে লাভ করে ভালোবাসা, আত্মীয়বোধ, তাঁর সাথে আলাপের নাম বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞান" – কিনা বিশেষ রূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে, সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ রূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়, এরই নাম বিজ্ঞান।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান আর অজ্ঞান প্রসঙ্গে বলেছেন, "যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে – এই বোধ, ততক্ষণ অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথা-হোথা বোধ - ততক্ষণ জ্ঞান। যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়।"

বেদের মন্ত্রে উল্লেখ আছে –

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" (তৈঃ উপঃ ৩/১)

যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, যা সব কিছুকে ধরে রেখেছে, লালন-পালন করছে এবং সব কিছু লয় প্রাপ্ত হয় – তুমি তাকে জানো।

নিজের অভিজ্ঞতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ – সব চলে যায়। সব শান্ত হয়ে যায়। তবে জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এসব তিনি আছেন বলেই আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১ এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, ১ পুঁছে ফেললে শূন্যে কোনও পদার্থ থাকে না।" "পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। নেতি নেতি

করে বিচারের শেষ হলে – ব্রহ্মজ্ঞান। বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় – "জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দু'টি লক্ষণ – প্রথম - অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালোবাসা; শুধু জ্ঞান বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালোবাসা নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ – কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।"

কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা কি এতই সহজ? এই কণ্টকময় দুনিয়ায় মানুষ যখন বিপর্যস্ত, মন যখন অশান্ত, লোভ, মোহ, অনাচার, অত্যাচারে জর্জরিত; ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, হতাশায় মানুষ যখন দিশাহারা – তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা কি সম্ভব?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "হ্যাঁ, সম্ভব।" তিনি বলেছেন, "দেখো, জ্ঞান অজ্ঞান পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। পাণ্ডিত্যের অহংকারও অজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার। অজ্ঞানরূপী কাঁটা আর জ্ঞানরূপী কাঁটা দু'টোই ফেলে দিতে হয়।"

প্রাচীন ভারতে মুনিঋষিরা কঠোর সাধনার মাধ্যমে এই পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই সাধনার ফলশ্রুতি- 'বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব, রজঃ তমঃ – এই তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।'

'বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান – এসবই তাঁর ঐশ্বর্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শত পুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, 'ভাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার

হও। যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে, যার সুখবোধ আছে, তার দুঃখবোধ আছে; যার পুণ্যবোধ আছে, তার পাপবোধ আছে; যার ভালবোধ আছে, তার মন্দবোধ আছে; যার শুচিবোধ আছে, তার অশুচিবোধ আছে; যার আমি বোধ আছে, তার তুমি বোধ আছে।'
তাইতো ঠাকুর বার বার বলেছেন, 'জ্ঞান, অজ্ঞানের পার হও।' তবেই তাঁকে বিশেষ রূপে জানা যায়।

গীতাতেও লেখা আছে, 'জ্ঞান পরাবিদ্যা, বিজ্ঞান অপরাবিদ্যা।'
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন –

'জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজজ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।' (গীঃ ৭/২)

অর্থাৎ আমি তোমাকে এই বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সব বলব যা জানার পর সংসারে আর কিছু জানার থাকবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, 'অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখে তিনিই আছেন। তিনিই কর্তা, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেছেন।'

'আমি' আর 'আমার' – এইটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; এইটির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান।

তিনি আরও বলেছেন, 'ঈশ্বরকে দেখা যায়, তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ইশ্বর দর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্স-এ ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সাথে ওটা মেশালে এই হয়, আর ওটার সঙ্গে এটা মিশালে এই হয় – এইসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষের খবর পাওয়া যায়। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁহাকে দর্শনের পর শাস্ত্র, সায়েন্স, সব খড়কুটো। তাঁকে জানলে সব কিছু জানা যায়। তবে এর জন্য সাধনা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান। 'মনের চতুর্থ ভূমি - হৃদয়'। তখন প্রথম

চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি! একি!' তখন তার নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না। 'মনের পঞ্চম ভূমি – কণ্ঠ।' মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা শুনতে বা বলতে ভালো লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

'মনের ষষ্ঠভূমি – কপাল।' মন যেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরূপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। 'শিরোদেশে সপ্তম ভূমি' – যেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়'।

ব্রহ্মজ্ঞানী তোতাপুরীর মার্গদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে মা কালীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, "ওঁ ওঁ ওঁ – মা আমি কি বলছি! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ কোর না – মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ো না। আমি যে ছেলে ভয় তরাসে। আমার মা চাই – ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার। ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!"

ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছেন আর গাইছেন –

'আমি ওই খেদে খেদ করি (শ্যামা),

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলছেন –

"তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, আমি তাঁকেই 'কালী' বলি। অর্থাৎ এক অবস্থায় যিনি নির্গুণ, নিরাকার, আর এক অবস্থায় তিনি সগুণ, সাকার। যখন তিনি সগুণ ও সাকার, তখন তিনি জীব, জগত, ব্রহ্মাণ্ড, তখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী ঈশ্বর, ভগবান, গড ও আল্লা। তিনি যেমন সাকার, তেমনই নিরাকার।"

কি সুন্দর অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির সরল বর্ণনা!

DO NOT COPY

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও ভারতীয় দর্শন এবং ঈশ্বর (God) শব্দটি মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎস হল এক মহান চালিকাশক্তি।'

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'নেচার' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে আইনস্টাইন লিখেছিলেন, 'ধর্ম বিনা বিজ্ঞান খঞ্জ এবং বিজ্ঞান বিনা ধর্ম অন্ধ।"

এইভাবে বিজ্ঞান সর্বদা ধর্মকে অনুসরণ করে চলেছে।

একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়েছেন, ''যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান, কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে, নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না। তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে। ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের জ্ঞান!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান গাইছেন –

'ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আসার আশা ভাঙ্গার দশা, প্রথমে পঞ্চুরি পেলাম।
পবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম তাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম!
ছ' দুই আট, ছ' চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ;
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজি ভোর হইল।'

'পঞ্চুরি অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূতে ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।'

'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ – তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই – সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে। তিন

গুণই চোর। তমঃগুণে বিনাশ করে, রজঃগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।'

কি চমৎকার কথা। কত উচ্চস্তরের কথা বলেছেন 'নিরক্ষর' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব -

"পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

অধুনা বিজ্ঞানীরাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ফিলিপ ফাইনম্যান বলেছেন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াকলাপ যেন 'ঈশ্বরের পাশা খেলা।' সূর্য ডোবে, চাঁদ ওঠে, গ্রহনক্ষত্র আকাশে সন্তরন করে। এসবই যেন পাশার ঘুঁটির চলাচল। বিজ্ঞানী দর্শক মাত্র। তিনি দেখতে পান না ঈশ্বরকে। দেখেন কেবল ঘুঁটির চলাচল। এই চলাচল দেখেই বিজ্ঞানকে জানতে হয়, আয়ত্বও করতে হয় পাশা খেলার নিয়মাদি। অশ্বের চাল কিংবা গজের গমন দেখে চিনতে হয় পাশার পাটাতন, অর্থাৎ মহাবিশ্বকে। কাজটা কঠিন, কৌতূহলোদ্দীপকও।"

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ধন্য তোমার বিজ্ঞান চিন্তন। তোমার বিজ্ঞান মানবের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত, ধ্বংসের জন্য নয়।

সাহিত্যিক যাযাবর ঠিকই বলেছেন, "আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ; তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।"

--- জয়তু রামকৃষ্ণ ---

তথ্যসূত্রঃ

শ্রীম রচিত রামকৃষ্ণ কথামৃত। এই লেখাটা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত। তাঁরই চরণকমলে ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্য।

DO NOT COPY

তোমার জন্য **সুনন্দন ঘোষ**

স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে
তেপান্তরের শেষ –
তোমার পথের পানে চেয়ে
নয়ন নির্নিমেষ।
জানিনা এই বাঁধন ছিঁড়ে
ফিরবো কবে আপন নীড়ে,
হৃদয় ভরে কুড়িয়ে নেবো
মোহন হাসির রেশ।

DO NOT COPY